প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ
ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ঃ জীবনকথা ও সৃষ্টিসম্ভার

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ঃ জীবনকথা ও সৃষ্টিসম্ভার

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর রেলশহর খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন রমাপদ চৌধুরী। সেখানেই তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। খড়্গপুরের রেলওয়ে স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করেন। বালক রবীন্দ্রনাথের মতোই স্কুল ও স্কুলের পড়া তাঁর কখনই ভালো লাগত না —" স্কুলের পড়া যেন একটা দায়। ক্লাসে বসে থাকতে থাকতে কোথায় যে ওর মন চলে যেত কে জানে। এক একদিন খুব সহজ প্রশ্নেরও ও উত্তর দিতে পারতো না। ... ও বয়েসে সবাই বোধহয় ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড খুঁজে বেড়ায়। খরগোশের কানের কোটরে গোলাপী আভার মধ্যে, ফড়িঙের স্বচ্ছ পাখনায় কিংবা গোলাপের চারার সদ্য গজিয়ে ওঠা একটি নতুন পাতায়।"[১] রমাপদ চৌধুরীর এই শৈশব স্মৃতিচারণা আমাদের বিভূতিভূষণের অপুর কথাও মনে করিয়ে দেয়। 'পথের পাঁচালী'র অপুর মতোই রমাপদও ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ বালক। রমাপদর যখন নিতান্ত কিশোর বয়েস, তখন 'অসহযোগ আন্দোলনে'র স্মৃতি মুছে যেতে না যেতেই দেশে শুরু হয়ে গেল এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে কয়েকজন য়ুরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর সর্বত্র দেখা দেয় চাপা উত্তেজনা। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত শহরে, সমস্ত জেলার ওপর বিদেশী সরকার ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাসের পর মাস কারফিউ, অকারণে যখন তখন বাড়ি সার্চ করা শুরু হ'ল। তার সাথে সংযোজিত হ'ল আর একটি 'অর্থহীন জব্দ আইন'। বাঙালি হবার অপরাধে কেউ সাইকেল চড়তে পাবে না। সূর্যাস্তের আগেই সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। যে দু'চাকার সাইকেলটি ছিল কিশোর রমাপদর নিত্যসঙ্গী এবং স্বাধীনতা — " রাগ অভিমান বুকে চেপে, দু'চোখ কান্নায় ভাসিয়ে সেই কিশোর ছেলেটি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আরো অনেকের পিছনে পিছনে তার সেই তুচ্ছ প্রিয় বস্তুটিকে টেনে টেনে নিয়ে গেল থানার দরজা অবধি। খাতায় সই করে থানার দারোগার কাছে জমা দিয়ে দিতে হ'ল।" [২] কিশোর রমাপদ কিছুতেই ভেবে পেলেন না — " ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে গুলি করে সন্ত্রাসবাদীরা যদি সাইকেল চেপে পালিয়েও থাকে, ঐ নিরীহ ছেলেটির নিরপরাধ সাইকেলটার কি অপরাধ।" [৩] নিঃসঙ্গ কিশোর রমাপদ যেন আরো বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন, পৃথিবীটাই তাঁর কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল — " মাসের পর মাস, বছর ঘুরে গেল। আর সেই ছেলেটির পৃথিবী ছোট হয়ে হয়ে বইয়ের পাতায় এসে আশ্রয় নিল।" [৪] তখন থেকেই কিশোর রমাপদর মধ্যে একটা প্রবল জেদ চেপে যায়। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠতে চান তিনি। একদিন খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ করে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সেকালে বাংলা বইয়ের জগৎ —বিশেষত বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছিল রমাপদর মতো কিশোর বালকদের কাছে একটা 'নিষিদ্ধ জগৎ'। অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুলের মাস্টারমশাই সকলেই এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বাড়িতে একটা বইভর্তি আলমারি থাকলেও তাতে হাত দেবার অধিকার ছিল না কিশোর রমাপদর। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি পেয়ে গেলেন সেই আলমারির চাবি। পিতা তারাপ্রসন্ন চৌধুরী কিশোর রমাপদকে জিজ্ঞেস করলেন— "আনন্দমঠ পড়েছিস তুই? "[৫] ভয় পেয়ে গেলেন রমাপদ। ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন যে, না, তিনি 'আনন্দমঠ' পড়েননি। তারাপ্রসন্নবাবু ছেলের ভীত, সন্ত্রস্ত মুখখানা দেখে হেসে ফেলেন। তারপর — "একটা চাবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়বি। খুব ভাল বই। বললেন, চাবিটা তোর কাছেই থাক।" [৬] মায়ের কিছুটা আপত্তি ছিল। কিন্তু, বাবা জানিয়ে দিলেন যে, সে এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। বাবার কথা শুনে কিশোর রমাপদ হঠাৎ করে যেন বড়-ই হয়ে গেলেন। শুধু বড় হওয়াই নয়,— " একটি নারীকে সেই প্রথম ভালবেসে ফেললাম। তার নাম কপালকুণ্ডলা। তার সঙ্গে আমি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম, লতা ঝোপের আড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ করে

দাঁড়িয়ে রইলাম, কাপালিকের ভয়ঙ্কর চোখে চোখ রেখে আমি তখন রুদ্ধশ্বাস, আমিই নবকুমার।" [৭] যে বয়েসে রমাপদর মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল গোয়েন্দা উপন্যাসে, সেই বয়েসে তিনি মুগ্ধ হলেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে। শোনা যায়, ছেলেবেলায় শার্লক হোম্‌সের রচনা দু'একবার পড়লেও সেগুলি যে তাঁকে খুব বেশি আকর্ষণ করত এমন নয়। একেবারে বাল্যকাল থেকেই রমাপদর সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছে বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালি রচিত সাহিত্য অবলম্বন করে।

রমাপদ রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। দেবতুল্য এই মানুষটিকে দেখে তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। যখন 'অর্থহীন জব্দ আইন' পুরোনো ও কিছুটা একঘেয়ে হয়ে গেছে, কারফিউর ধার কমে গেছে, তখন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বেড়ানোর নেশা রমাপদকে পেয়ে বসে। ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে তিনি চলে যেতেন খড়্গপুরের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে। একদিন দেখতে পেলেন—

> একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন দ্রুত এগিয়ে আসছে হুইস্‌ল দিতে দিতে। আমরা পৌঁছানোর আগেই ট্রেনখানা এসে থেমে গেছে। যাত্রীরা তখনো বোধহয় ঘুমে অচেতন। জানালাগুলো বেশিরভাগই বন্ধ। তবু তারই ওপর দিয়ে চোখ পিছলে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে থামলো। সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না, সে মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। অভিভূতের মত কাছে এগিয়ে গেলাম। নির্লজ্জের মত সেই দেবদর্শন রূপের দিকে তাকিয়ে রইলাম স্থির দৃষ্টিতে ... একটি কিশোরের জীবনকে এমনভাবে আর কেউ তোলপাড় করে দিয়ে যায় নি। তখন প্রতি মুহূর্তে তিনি যেন আমার পাশে পাশে , চোখ বুজলেই যেন তাঁর অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।[৮]

রমাপদ গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্রকেও দেখেছেন একেবারে কাছে থেকে। স্বনামধন্য রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরিকেও তিনি দেখেছেন। হিজলীর রাজবন্দীদের সাথে দেখা করতে এসে গান্ধীজী উঠেছিলেন সেখানকার গুজরাতি স্কুলটিতে। 'স্ট্রাইক ময়দানে' শুনেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজসিক বক্তৃতা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গিরিসাহেব ছিলেন ছিপছিপে স্মার্ট চেহারার মানুষ, ইংরেজিতে ঝড়ের মতো বক্তৃতা দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীতে তর্জমা করে দিতেন অন্য একজন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সমবেত জনতা উত্তাল হয়ে উঠত— এ-সব রমাপদর মনে অদ্ভুত ধরণের শিহরণ জাগিয়ে তুলত। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা-সংগ্রামী কিংবা বড় মাপের রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি রমাপদর অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকলেও, রাজনীতি তাঁকে একেবারেই আকর্ষণ করেনি। তাঁর কাছে এ-সবের প্রভাব ছিল একেবারেই তাৎক্ষণিক। পরবর্তীকালে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজনীতি বিষয়ে তাঁর ঔদাসীন্যের কারণ জানতে চাইলে তিনি অকপটে বলেন —

> প্রেক্ষিতের বাস্তবতা যাইহোক, সত্যি বলতে কি রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আমাকে কোনোদিন তেমন আকর্ষণ করেনি। একথা ঠিক তখনকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কিছু উত্তাপ আমাকে কখনো ছুঁয়ে গেছে। তবে সেসব সাময়িক, কোনও ধারাবাহিকতা ছিলনা। ...আসলে আমার কাছে মানুষের হাতে মানবিকতার লাঞ্ছনাটাই চিরদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা নিরুপায় মানুষ, তার সম্মান, সংসার তার অস্তিত্বের গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তাহীনতার বিপন্ন বোধ, মান-অপমানের টানাপোড়েন এসবই আমাকে ভাবাত সবসময়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি নিশ্চয় বড় কথা। কিন্তু শেষকথা নয়। এই প্রাপ্তি আংশিক প্রাপ্তি মাত্র। এতে কি মানুষ—যদি এই মানুষ হয় এক মধ্যবিত্ত কিংবা আরও নিম্নবিত্তের শ্রেণীভুক্ত,—তাহলে তার যেসব সঙ্কট অর্থাৎ বেঁচে থাকার, সংসারে আর দু-দশজনকে নিয়ে বেঁচে থাকার যে সঙ্কট—তা কি রাজনৈতিক নেতারা কাটিয়ে দিতে পারবেন? [৯]

রমাপদ চৌধুরী 'প্রেসিডেন্সি কলেজে'র ছাত্র ছিলেন। পরে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন কলকাতায় এসে 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' ভর্তি হলেন এবং থাকেন 'ইডেন হিন্দু হোস্টেলে', তখন হোস্টেলের লাইব্রেরি আর কলেজ স্ট্রীটের বইবাজার

তাঁর পাঠাভ্যাসের নেশাকে বাড়িয়ে দেয়। জন্মভূমি খড়্গপুরে একপ্রকার নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের পর কলকাতায় এসে রমাপদ যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে গেলেন। 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' ভর্তি হবার পর রমাপদ পেয়ে গেলেন সমমনস্ক দু'জন বন্ধুকে— একজন 'প্রেসিডেন্সি কলেজে'রই ছাত্র প্রাণতোষ ঘটক, আর অন্যজন- 'বিদ্যাসাগর কলেজে'র ছাত্র স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাণতোষ এবং স্বরাজ—দু'জনেরই প্রবল আগ্রহ ছিল লেখালেখিতে। এই দুই বন্ধুর নাছোড়বান্দা অনুরোধেই একদিন 'ওয়াই.এম.সি.এ' রেস্তোরাঁর পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে রমাপদ রচনা করলেন তাঁর জীবনের প্রথম ছোটগল্প এবং সেটিকে ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দিলেন 'আজকাল' সাহিত্য পত্রিকার দফ্তরে। পরের সপ্তাহেই গল্পটি 'ট্র্যাজেডি' নামে প্রকাশিত হয়। 'ট্র্যাজেডি' রচনার প্রায় এক বছর পর রমাপদ রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'বারো ঘোড়ার আস্তাবল' এবং 'উদয়াস্ত'। 'বারো ঘোড়ার আস্তাবল' গল্পটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' এ প্রকাশিত হয় 'শান্তা' শিরোনামে। সেই সময়ে 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' সম্পাদনা করতেন মন্মথনাথ সান্যাল এবং সুবোধ ঘোষ। সম্পাদক কর্তৃক গল্পনাম পরিবর্তন এবং গল্পের কিছুটা অংশ বাদ দেওয়ায়, ছাপা হওয়া সত্ত্বেও মনের মধ্যে এক প্রবল বিস্বাদ অনুভব করেছিলেন তরুণ গল্পকার রমাপদ। এই বিস্বাদ অবশ্য ভুলে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন কিছুদিন পরেই। এই বছরেই 'যুগান্তর সাময়িকী'র কার্তিক সংখ্যায় 'উদয়াস্ত' গল্পটি লেখক প্রদত্ত নামেই প্রকাশিত হল। রমাপদ যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র, তখন পরপর কয়েকটি গল্প ছাপা হয়েছে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'চন্দ্রভস্ম' গল্পটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাতেও তিনি প্রায় নিয়মিত গল্প লিখতেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত 'মাসিক বসুমতী','মেঘনা', 'সাপ্তাহিক দেশ', 'শারদীয় দেশ' প্রভৃতি পত্রিকাতেও প্রচুর গল্প প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসেই রমাপদ একজন প্রতিষ্ঠিত গল্প-লেখকের সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন হ'ল লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত অনুপ্রেরণা রমাপদ কোথায় পেলেন? শোনা যাক এ বিষয়ে স্বয়ং লেখকের জবানবন্দীর অংশ বিশেষ—

> শৈশবে যে বই পড়ে সারাজীবন ধরে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড খুঁজে বেড়িয়েছি, কিংবা যাঁকে রক্ষণশীলতার প্রতীক মনে করতাম, আলমারির চাবিটা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আনন্দমঠ পড়েছিস', ভোরের কুয়াশামাখা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনের জানালায় দেখা রবীন্দ্রনাথ, কিংবা সুন্দর মাসির মৃত্যুতে বুক নিঙড়ানো দুঃসহ ব্যথা—কিংবা যৌবনসন্ধির উদ্দীপ্ত দু'টি বন্ধুমুখ—প্রেরণা বলে যদি সত্যিই কিছু থাকে তা হয়তো রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এর সবগুলির মধ্যেই; কিংবা সেই অভিমানী বালকটির গোপন দুঃখের মধ্যে। [১০]

পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর এবং সুবোধ ঘোষের কথাও রমাপদ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। স্পষ্টতই বোঝা যায়, তিনি সাহিত্যরচনার প্রেরণা পেয়েছেন একাধিক উৎস থেকে— বাবা, বই, রবীন্দ্রনাথ, বন্ধুপ্রেরণা, জন্মভূমির নিঃসঙ্গতা, সুন্দর-মাসীর স্নেহ—তাঁর অপমৃত্যুর দুঃসহ ব্যথা প্রভৃতি। তবে, সমস্ত প্রেরণার মূল যে রবীন্দ্রনাথই সে-কথাও তিনি জানাতে ভোলেননি — " যাঁর লেখাই আমাকে প্রথম জীবনে প্রভাবিত করে থাক না কেন, আসলে যে তা রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাব, এর চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর নেই। ত্রিবেণিতে ডুব দিলেও উৎস তো সেই গঙ্গোত্রী।" [১১]

রমাপদ যে সময়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন বাংলা সাহিত্যসভায় নিজের স্বতন্ত্র আসনটিকে খুঁজে নেওয়ার কাজটা খুব একটা সহজ ছিলনা —

> গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পে সদ্য অভিভূত এবং অবাক করে দিয়ে গেছেন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' তখন রাঢ়ের কৃপণ মাটিকে শস্যশ্যামল করে তুলেছে। 'পথের পাঁচালী' তখন ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে, অকারণ হলেও কেউ কেউ তাঁকে জাঁ ক্রিস্তফের সঙ্গে

তুলনা করে বসে। বনফুলের গল্প এবং 'রাত্রি' উপন্যাস তখন সকলকে চমকে দিচ্ছে। অন্তত পনেরো জন খ্যাতিমান লেখককে নিয়ে বাংলা সাহিত্য তখন গর্বিত। ঠিক তখনই 'দেশ', 'আনন্দবাজারে' উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো কয়েকটি গল্প সকলের চোখ ঝলসে দিল। 'ফসিল', 'সুন্দরম','অযান্ত্রিক'। এমনটি বাংলা গল্পে আগে দেখিনি। তখন যাঁরা সাহিত্যে নবাগত তাঁদের প্রায় সকলের লেখাতেই তাঁর আদল। অন্তত ভাষায়। আমাদের তো তখন সাহিত্যে হাতেখড়ি, আমাদের তিন বন্ধুর ওপরই তার ছাপ পড়ল।[১২]

অতঃপর রমাপদ তাঁর অগ্রজদের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আপন চেতনায় ধারণ করে সাহিত্যসভায় নিজের আসনটি খুঁজে নিলেন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে দেখা দিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে।

ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই সাহিত্যিক হিসেবে রমাপদর আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে লেখকের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি— " অনেকের মতই ছোটগল্প আমারও প্রথম প্রেম। কিন্তু আমি তার প্রতি অবিচল থাকতে চেয়েছিলাম। কারণ, আমার ভালবাসার অনেকখানি জুড়ে আছে সে। আমি তার মুখে সাফল্যের হাসি দেখতে চেয়েছিলাম, আজও চাই।" [১৩] বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একমাত্র ছোটগল্পের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, তারপর তিনি আর উপন্যাস রচনার হাতছানি উপেক্ষা করতে পারলেন না। রমাপদ দেখতে পেলেন, তাঁর সহযাত্রীদের অনেকেই উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলেছেন। 'ছোটগল্প লিখে লাভ নেই', 'ছোটগল্পের বই বিক্রী হয়না', 'লেখকের শক্তির পরীক্ষা তো ছোটগল্পে নয়, উপন্যাসে'—ইত্যাদি নানা পরামর্শ অনেকেই দিতে লাগলেন। লেখক রমাপদও যেন তখন তাঁর অন্তর্সত্তার ডাক শুনতে পেলেন — " তুমি জীবন থেকে সরে যাও বলেই কল্পনায় একটা মৃতদেহকে পুষ্পপত্রে চন্দনতিলকে সাজিয়ে তোলো। তুমি জীবনের কাছে ফিরে এসো, জীবনের কথা লেখো, জীবনের উপন্যাস।" [১৩] অতঃপর একসময় কল্পনার একেবারে গভীরে ডুব দিয়ে ফিরে গেলেন জন্মভূমি খড়্গপুরের শৈশব ও কৈশোর জীবনে। সেখানকার চাঁদমারি ময়দান, লাল কাঁকরের রাস্তা, চাকা-চাকা-চাকা সাইকেলের স্রোতের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন অজস্র চেনামুখ, তুচ্ছ নানা ঘটনা। সেই সব চেনা মুখ এবং নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবলীই হয়ে উঠতে লাগল উপন্যাসের উপকরণ। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'। বস্তুত, 'প্রথম প্রহর' রমাপদর প্রথম উপন্যাস হলেও তথ্যের খাতিরে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, লেখক তাঁর নিতান্ত কিশোর বয়েসেই একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র। একদিন শুনতে পেলেন তাঁর এক সহপাঠীর মা—যাঁকে তিনি 'সুন্দরমাসী' বলে ডাকতেন, তিনি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। 'সুন্দরমাসী'র অকালমৃত্যু কিশোর রমাপদকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়েন এবং সেই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে রচনা করেন একটি উপন্যাস 'চোরাবালি'[১৫]। রচয়িতার নিজের মুখে এই উপন্যাসের পাঠ শুনে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন তাঁর এক মামিমা আর আত্মীয়স্বজন। কিন্তু, এই উপন্যাস রমাপদকে স্বস্তি দেয়নি — " খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর চারপাশ থেকে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছিল সেদিন। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পাণ্ডুলিপি উনোনের আগুনে গুঁজে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম। পোড়া পাণ্ডুলিপির ধোঁয়া লেগে সেই কিশোর বালকটির চোখে জল এসে গিয়েছিল।"[১৬]

যে শহরে জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন রমাপদ, সেখানকার বিচিত্র পরিবেশ তাঁকে ঔপন্যাসিক হয়ে উঠতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে —

> রেলের সেই উপনগরী তখনো প্রকৃতির কোলে আধ-ফোটা শহর। বনজঙ্গল কেটে শক্ত পাথুরে জমিকে যতখানি সম্ভব সমতল বানিয়ে শহর তখন হাত-পা ছড়িয়ে চারপাশের অনেকখানি অবধি জুড়ে বসেছে, জুড়ে বসেছে বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে যেমন ছোটছোট স্মৃতির কৌটো ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে থাকে , তেমনি শহরটার

> এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল লুপ্ত দিনের অরণ্যের আভাস। পুব-পশ্চিমে পাশাপাশি অসংখ্য জোড়া জোড়া রেললাইন, তার একধারে চওড়া চওড়া রাস্তা পরস্পরকে কাটাকুটি করে চলে গেছে। ...আর রেললাইনের এপারটা ছিল একটা ক্ষুদে ভারতবর্ষ, এক একটা পাড়া যেন এক একটা প্রদেশ। ... একদিকে হাজার কয়েক ইউরোপীয়ান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান,আরেকদিকে হাজারে হাজারে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাটি বাঙালী। আর দূরে দূরে অন্ধ্রবাসী বা ছত্তিশগড়ীদের, বিহারী মুসলমানদের শ্রমিকপল্লী। [১৭]

আরেকটি তথ্য এখানে জানানো প্রয়োজন যে, বাল্যকাল থেকেই রমাপদ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন পর্যাপ্ত। তাঁরা প্রায় প্রতি বছরই মাস খানেকের জন্যে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতেন। কখনো আগ্রা, দিল্লী, রাজস্থান, কখনো মধ্যভারত, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এক একদিকে এক একবার। কিন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ইতিহাসের স্বাক্ষর খুঁজে বেড়ানোয় তাঁর তত আগ্রহ ছিলনা, তাঁর ভালো লাগত বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র মানুষদের। যাদের দেখতে পেতেন, তারাই তাঁকে অবাক করে দিত। তিনি আনন্দে অস্থির হয়ে উঠতেন মানুষের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসার কথা কাউকে না কাউকে জানাবার জন্যে। এভাবেই রমাপদর মধ্যে একজন সত্যিকারের লেখকের মন তৈরি হয়ে যায়। জন্মভূমির বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনের নানা অভিজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে মনের কোণে জমে ওঠে উপন্যাস-শিল্পের পর্যাপ্ত উপকরণ। পরে উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলিই জন্ম দেয় এক একটি বিখ্যাত উপন্যাসের।

'প্রথম প্রহর' রমাপদ চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লালবাঈ'। উপন্যাসটির রচনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন —

> আমার পরের উপন্যাস, আমার প্রথম এবং একমাত্র অতীতভ্রমণ 'লালবাঈ' ... সঙ্গীতের নদীতে আমার সেই কল্পনার পাল তুলে ভেসে যাওয়া। আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার কথা। মধ্যরাত্রির একটি গানের জলসায় বিমুগ্ধ হয়ে গেছি, কি এক নৈসর্গিক আনন্দে যেন মন ভরে গেছে। বিষ্ণুপুর ঘরানা নামটা তখন পর্যন্ত আমার কাছে অস্পষ্ট, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তারপর বহুদিন পর্যন্ত সেই গানের রেশ আমার শিরা-উপশিরায় নেচে বেড়ালো। তখন তো উপন্যাস লেখার কথা আমার মনেও হয়নি। শুধু একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যেই বইয়ের পাতা উল্টে গেছি, কেন লিখেছি তাও আমার কাছে স্বচ্ছ নয়। [১৮]

'লালবাঈ' উপন্যাসটি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের এক বছর পর, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ ডি.এম লাইব্রেরি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি সেকালের পাঠকদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও ঔপন্যাসিক রমাপদ তাঁর সাহিত্যজীবনে আর একটিও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন না। আসলে ইতিহাসের ধূসর জগতে পদচারণা করা ঔপন্যাসিক রমাপদর একেবারেই মানস অভিপ্রেত ছিল না। অতীত কল্পনার জগতে ডুব দিয়ে, সেখান থেকে জীবনকে তুলে আনার চেয়ে বরং তিনি জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—সেই জীবনকেই উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। ঔপন্যাসিক নিজেই তাঁর মানস-প্রবণতার পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন — " আমি তো জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র মৃত্তিকাগন্ধের জীবন নয়, যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, যে জীবন বাইরের জগতের সঙ্গে এক হাতে, নিজের আত্মবিরোধের সঙ্গে আর এক হাতে অবিরত পাঞ্জা লড়ে চলেছে, আমি তারই ভাষ্যকার হতে চেয়েছি।" [১৯] রমাপদ রাজনীতি সচেতন; স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে উত্তাল ভারতীয় রাজনীতির জীবন্ত সাক্ষী তিনি—অথচ রাজনীতি তাঁকে একেবারেই আকর্ষণ করেনি। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষমতাও যে তাঁর মধ্যে ছিল—তাও তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু, সে পথেও তিনি বিশেষ পদচারণা করলেন না। প্রকৃতপক্ষে কেউ কেউ ছিলেন, আছেন —যাঁরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকেও মহৎ করে তোলার ক্ষমতা রাখেন। রমাপদ এমনি একজন ঔপন্যাসিক— যিনি বাঙালি

মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছ বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবলী অবলম্বন করেই একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছেন এবং বাংলা উপন্যাসের জগতে অবিসংবাদিতভাবেই দেখা দিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে। উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকেই সারাজীবন ধরে আঁকড়ে থাকার আরেকটি প্রধান কারণ রমাপদর উপন্যাসাবলীর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। রমাপদর পূর্বোক্ত মন্তব্যের সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবনের গল্প লিখতে চাননি, তিনি চেয়েছেন জীবনের ভাষ্যকার হতে, মধ্যবিত্ত জীবনের ভাষ্যকার। প্রকৃতপক্ষে একজন ভাষ্যকারের কাজই হ'ল চলমান ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া। জীবনের ভাষ্যকার হতে গেলে মানুষকে ডুব দিতে হয় জীবনের গভীরে। ঔপন্যাসিক রমাপদ স্বাধীনতা-পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। লক্ষণীয়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছক ও ছবিটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। যে স্বাধীনতা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণিকে তাদের বহু প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিল, কালক্রমে প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটতেও খুব বেশি সময় লাগল না। উপরন্তু, বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ যখন আর কিছুতেই নিজেদের প্রত্যাশা আর বাস্তব জীবনের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না, তখন আত্মসঙ্কট, আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। মানবিক মূল্যবোধগুলিও পরিবর্তিত হতে থাকে। চিত্তের ব্যাপকতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে হতে স্বার্থপরতার রূপ নেয়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি একসময় প্রগতির মানদণ্ডে সারা ভারতবর্ষে নজর কেড়েছিল, তার এই পরাভব সংবেদনশীল মানুষের কাছে সত্যিই বেদনার। ঔপন্যাসিক রমাপদর মনে হয়তো বা দেখা দিয়েছিল একটি সংশয় —মধ্যবিত্ত শ্রেণিসমাজের এই পরাভব কি তার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত? — সুতরাং, প্রয়োজন দেখা দিল 'মধ্যবিত্ত' মানুষটিকে ভালো করে চিনে নেবার। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন —

> আমাদের বুদ্ধিজীবী বা দুর্বুদ্ধিজীবীরা সারাদিনে একবারও 'বাঙালি' শব্দটা উচ্চারণ করেন কিনা সন্দেহ। সুখের কথা প্রাদেশিকতার ছিটেফোঁটাও তাঁদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের আলাপে-আলোচনায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দটা প্রায় অব্যয়ের মতো অতি-ব্যবহৃত। অথচ এই মধ্যবিত্ত মানুষটি কে? বর্ণচোরা বহুরূপীর মতোই ইনি তো বহুরূপে সামনে এসে দাঁড়ান। তখন খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য কোন্ বর্ণটা এঁর খাঁটি। এমন বাঙালি কমই আছেন যাঁরা নিজেদের মধ্যবিত্ত মনে করেন না। পথেঘাটে হাটেবাজারে পল্লীর অন্তিম অংশে যাদের দেখে ভিন্ন শ্রেণি মনে হতে পারে, তাঁদের অনেকেই কিন্তু বড় একটা অন্ত্যজ আয়ের মানুষ নন।[২০]

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী মধ্যবিত্ত সমাজ ও সেই সমাজের মানুষদের চিরে চিরে দেখতে চান। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই 'ব্যক্তি'র যথার্থ স্বরূপটি চিনে নেওয়া সহজ বলেই বিশ্বাস করেন তিনি। কাজেই তাঁর উপন্যাসে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশেষ নেই বললেই চলে। বাঙালি মধ্যবিত্তের 'বহুরূপী' রূপ তুলে ধরে অতঃপর ঔপন্যাসিক দেখাতে চান — মধ্যবিত্তের জীবনধারা বদলে গেছে বা 'ভ্যালুজ' বদলে গেছে বলে চারপাশে উচ্চরব শোনা গেলেও, ভেতরে ভেতরে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা বদলেছে কতটা। সর্বোপরি, একজন সংবেদনশীল ঔপন্যাসিক হিসেবে মধ্যবিত্ত বাঙালি সামাজিক শ্রেণির মানুষদের জীবনের সদর্থক মূল্যবোধে স্থিত হবার বাসনার প্রসঙ্গটিকেও তিনি তুলে ধরতে চান উপন্যাসের হিরন্ময় দর্পণে।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী আজ আর কিছুতেই 'না লিখে লেখক' নন। তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবনে দেড়শোর মতো ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি পঞ্চাশের কাছাকাছি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাছাড়া, একজন লেখকের জনপ্রিয়তা, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য রচনার সংখ্যাগত দিকটি কোনো বিশেষ মানদণ্ড হতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী কিন্তু খুব বেশি উপন্যাস রচনা করেননি। এমনকি বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক', 'পথের পাঁচালী' ছাড়া আর কোনো উপন্যাস রচনা না করলেও জনপ্রিয়তা, খ্যাতি তাঁর একটুও কমে যেত না। আমাদের দেশে আদিকবি বাল্মীকি, কাশীরাম, কৃত্তিবাসও একাধিক গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় হননি। আসলে একজন লেখক কতগুলো গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন—তা আদৌ কোনো সাহিত্যিক প্রশ্ন হতে পারে না; বরং-তিনি কী লিখেছেন এবং কীভাবে লিখেছেন — সেইটেই বিচার্য হওয়া উচিত। তবে, মহৎ লেখকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে একটু বেশিই থাকে —তা অনস্বীকার্য।

রমাপদ চৌধুরী একই সঙ্গে ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। তাঁর 'গল্পসমগ্র' গ্রন্থটিতে মোট ১৪৪টি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে। এ যাবৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'তিনতারা'(১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), 'স্বর্ণমারীচ'(১৩৫৭), 'অভিসার রঙ্গনটী'(১৩৫৮), 'দরবারী'(১৩৬১), 'পিয়াপসন্দ'(১৩৬২), 'আপনপ্রিয়'(১৩৬৪), 'কথাকলি'(১৩৬৬), 'মুক্তবন্ধ'(১৩৬৬),দেহলি দিগন্ত'(১৩৬৯),'সুখের পায়রা'(১৩৭৩), 'ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প'(১৩৭৬), 'পোস্টমর্টেম'(১৩৮৯) প্রভৃতি। অবশ্য উল্লিখিত এই গল্পগ্রন্থগুলোর সবই যে বর্তমান সময়ে সুলভ —তা নয়। তবে, প্রায় প্রতিটি গল্পগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত গল্প নিয়ে তাঁর 'গল্প সমগ্র' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। রমাপদর বিভিন্ন গল্প সংগ্রহের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছে 'দরবারী'। এই গ্রন্থের গল্পগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। পুরস্কার হিসেবে 'বিপাশা' উপন্যাসটি তিনি রমাপদকে উৎসর্গ করেছিলেন। গল্পকার হিসেবে রমাপদর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার প্রমাণ তাঁর রচিত বহু গল্প হিন্দী, মালয়ালাম, গুজরাতি ও তামিল ভাষাতেও অনুদিত হয়েছে। বহু গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করে সরোজ আচার্য, লীলা রায় রমাপদকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। 'ভারতবর্ষ' গল্পটি 'দেশ সাপ্তাহিকে' প্রকাশিত হবার পর 'শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়'-এর অধ্যাপক ক্লিন্টন বি সিলি গল্পটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'লিটারেরি অলিম্পিয়ান্‌স' গ্রন্থে গল্পটিকে ঠাঁই দিয়েছেন। বস্তুত, রমাপদই একমাত্র ভারতীয় গল্প লেখক—যাঁর গল্প 'লিটারেরি অলিম্পিয়ান্‌স' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এবার, আমাদের গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল বিষয় রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসের একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে—

১. 'প্রথম প্রহর' — পৌষ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। ডি. এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।
২. 'লালবাঈ'— 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় আষাঢ়, ১৩৬২ থেকে বৈশাখ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। ডি.এম লাইব্রেরি। কল—৬।
৩. 'অন্বেষণ'—১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। কলকাতা—১২।
৪. 'অরণ্য আদিম'— ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। ডি.এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।
৫. 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ্' — ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। আভেনির। কলকাতা—১৯।
৬. 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস'— বৈশাখ, ১৩৬৭। ডি. এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।
৭. 'দুটি চোখ দুটি মন'—১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ। ডি.এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬। এই উপন্যাসটি পরবর্তীকালে 'আলো আঁধার' নামে প্রকাশিত হয়েছে।
৮. 'আরো একজন' — শ্রাবণ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। ডি. এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।
৯. 'বনপলাশির পদাবলী'— 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৭ই অক্টোবর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০শে জুন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জুন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

১০. 'পরাজিত সম্রাট'—১৩৭২ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— এপ্রিল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

১১. 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর'—১লা বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। ডি.এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।

১২. 'জরির আঁচল'— মাঘ,১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কলকাতা—১২।

১৩. 'এখনই'— ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ থেকে ২২শে মার্চ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'দেশ সাপ্তাহিক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। ডি.এম লাইব্রেরি। কলকাতা—৬।

১৪. 'পিকনিক'— ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকা। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ —নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। কল—৯।

১৫. 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'— ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

১৬. 'সীমন্তির গল্প' — মার্চ,১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা—৯।

১৭. 'অ্যালবামে কয়েকটি ছবি'— ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা-১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— ডিসেম্বর ১৯৭৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

১৮. 'খারিজ'— ১৩৮১ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কল—৯।

১৯. 'লজ্জা'— ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা-১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কলকাতা—৯।

২০. 'হৃদয়'— ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২১. 'বীজ'— ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২২. 'দ্বিতীয়া'—১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা—৭৩।

২৩. 'রূপ'— ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৮০। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২৪. 'চড়াই'— ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জুন ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ। দে'জ পাবলিশিং। কল—৭৩।

২৫. 'স্বজন'— ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— বৈশাখ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ। দে'জ পাবলিশিং,১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কল—৭৩।

২৬. 'অভিমন্যু'—১৩৮৮ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — মার্চ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২৭. 'বাহিরি'— ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা. লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— বৈশাখ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২৮. 'ছাদ'—১৩৯০ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৮৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

২৯. 'শেষের সীমানা'—১৩৯১ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জুলাই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩০. 'বাড়ি বদলে যায়'— ১৩৯২ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — বইমেলা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩১. 'আকাশ প্রদীপ'— ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩২. 'দাগ' — ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—জানুয়ারী ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৩. 'আশ্রয়'— ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—জানুয়ারী ১৯৮৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৪. 'অহঙ্কার'— ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—জানুয়ারী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৫. 'স্বার্থ'— ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—জানুয়ারী ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৬. 'রাজস্ব'— ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৭. 'ডুবসাঁতার'— ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৮. 'সাদা দেয়াল'—১৪০০ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — জানুয়ারী ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৩৯. 'পাওয়া'—১৪০১ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— নভেম্বর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪০. ' জৈব'— ১৪০২ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ– মে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪১. 'অংশ'— ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— এপ্রিল ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪২. 'তিনকাল' — ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— এপ্রিল ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৩. 'আজীবন' ১৪০৫ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৪. 'বেঁচে থাকা'— ১৪০৬ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — জানুয়ারী ২০০০ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৫. 'একা একজীবন'—১৪০৭ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ জানুয়ারী ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯। গ্রন্থটি রমাপদ চৌধুরীর 'দশটি উপন্যাস' (২০০১) সংকলন গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

৪৬. 'মানুষের সংসার'— ১৪০৮ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ—জানুয়ারী ২০০২ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৭. 'ভবিষ্যৎ'— ১৪০৯ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — জানুয়ারী ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৮. 'সুখ দুঃখ' — ১৪১০ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয়া আনন্দবাজার'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ — জানুয়ারী ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

৪৯. 'পশ্চাৎপট'— ১৪১১ বঙ্গাব্দ। 'শারদীয় দেশ'। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। গ্রন্থাকারে প্রকাশ— জানুয়ারী ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি। কল—৯।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, এ যাবৎকাল পর্যন্ত রমাপদ চৌধুরীর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ৪৯টি। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'শারদীয় দেশ' ও 'শারদীয়া আনন্দবাজার' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বছরে গড়ে একটির বেশি উপন্যাস তিনি রচনা করেননি। বস্তুত, উপন্যাস লেখার জন্যে অন্তরের প্রবল তাগিদ থাকা চাই। অন্তরের তাগিদ না পেলে রমাপদ কখনই লিখতেন না। সঙ্গত কারণেই তাঁর একটি উপন্যাসকেও উপেক্ষা করা যায় না। কথা-সাহিত্যিক রমাপদর সুখ্যাতি জুটেছে প্রচুর। তাঁর 'গল্প সমগ্র' গ্রন্থটি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার'-এ সম্মানিত হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'রবীন্দ্র পুরস্কার', ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'শরৎচন্দ্র পদক', ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। 'বাড়ি বদলে যায়'(১৯৮৫) উপন্যাস রচনার জন্য ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্র শিল্পে রূপায়িত হয়েছে। স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, অশোক বিশ্বনাথন্ প্রমুখ ছিলেন রমাপদর গুণমুগ্ধ। 'খারিজ' উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন বিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেন। 'কান চলচ্চিত্র উৎসবে' এই ছবিটি সম্মানিত হয়েছে। 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'— 'অগ্রগামী'র পরিচালনায় ছবি হয়েছে। অভিনেত্রী কাবেরী বসু এই সিনেমাটিতেই শেষবারের মতো অভিনয় করেন। 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ্' উপন্যাসের কাহিনী থেকে সিনেমার চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন সুমহান চিত্র পরিচাল ঋত্বিক ঘটক। ছবিটি অবশ্য পরিচালনা করেছিলেন গুরু বাগচী। 'অভিমন্যু' হিন্দী চলচ্চিত্রে রূপায়িত— 'এক ডক্টর কি মৌত'। পরিচালনায় তপন সিংহ। পঙ্কজ কাপুর, শাবানা আজমি এই ছবিটিতে অসাধারণ অভিনয় করেন। পরিচালক তপন সিংহ 'এখনই' উপন্যাসটিকেও চিত্রায়িত করেছেন। 'রূপ' তিন পর্বের টিভি সিরিয়াল— পরিচালনা করেছেন অশোক বিশ্বনাথন্। 'দাগ'— 'দূরদর্শনে' প্রদর্শিত হয়েছে ১৩ পর্বের ধারাবাহিক হিসেবে। 'বনপলাশির পদাবলী' পরিচালনা করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার। 'বীজ' উপন্যাসটিও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। বলা যায়, ঔপন্যাসিক রমাপদর হাত ধরে বাংলা, হিন্দী চলচ্চিত্র শিল্পও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে।

নির্দেশিকা —

১. 'ঋষি, দস্যু, এক কিশোর বালক' — রমাপদ চৌধুরী। 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা— ১৫৪-১৫৫।
২. তদেব। পৃষ্ঠা—১৫৬।
৩. তদেব। পৃষ্ঠা— ১৫৬।
৪. তদেব। পৃষ্ঠা— ১৫৬।
৫. তদেব। পৃষ্ঠা—১৫৬।
৬. তদেব। পৃষ্ঠা—১৫৬।
৭. তদেব। পৃষ্ঠা—১৫৬।
৮. তদেব। পৃষ্ঠা— ১৫৭।
৯. 'সাপ্তাহিক বর্তমান'কে দেওয়া রমাপদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার। 'সাপ্তাহিক বর্তমান'। ২১শে অক্টোবর, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা—১৯।
১০. 'ঋষি,দস্যু, এক কিশোর বালক'—রমাপদ চৌধুরী। 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা— ১৬।
১১. তদেব। পৃষ্ঠা—১৬০।
১২. তদেব। পৃষ্ঠা—১৬০।
১৩. তদেব। পৃষ্ঠা—১৬৪।
১৪. তদেব। পৃষ্ঠা—১৬৫।
১৫. 'চোরাবালি' উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি রমাপদ নিজেই যেহেতু নষ্ট করে দিয়েছেন, তাই এটি দেখা সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটির নাম যে 'চোরাবালি' ছিল—তা জানা যায় লেখকের 'লেখালেখি' নামক রচনা থেকে। 'গদ্য সংগ্রহ'—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী,২০১১। 'এবং মুশায়েরা'। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১২৭।
১৬. 'ঋষি,দস্যু, এক কিশোর বালক'—রমাপদ চৌধুরী। 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২ বঙ্গাব্দ। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রা.লি। কলকাতা—১। পৃষ্ঠা—১৫৮।
১৭. তদেব। পৃষ্ঠা— ১৫৩-১৫৪।
১৮. তদেব। পৃষ্ঠা—১৬৮।
১৯. তদেব। পৃষ্ঠা— ১৬৯।
২০. 'আমরা', 'গদ্য সংগ্রহ'—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী,২০১১। 'এবং মুশায়েরা'। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১১।
২১. 'প্রসঙ্গকথা', 'গল্প সমগ্র'—রমাপদ চৌধুরী। দ্বিতীয় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর,১৯৯৯। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৮৭৫।